Continued from part 4

উদাসভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। জন্মভূমির জন্য তার মন গুমরে কেঁদে মরে।

প্রায় চার সপ্তাহ পর শিবিরে এলাম। আমাকে দেখেই একটা চাপা হৈচৈ পড়ে গেল। সবাই দৌড়ে এসে আমার সামনে দাঁড়ায়। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। কিছু বলেনা। ভাবলাম হয়ত অনেক দিন ধরে দেখেনা তাই এমনিভাবে তাকায়। আমি এগিয়ে যাচ্ছি। আমার পিছু পিছু সবাই হাঁটছে। খুব কাছের যারা তাদেরকে কুশলাদি জিজ্ঞেস করি। তারা উত্তর দেয়। প্রশ্ন করেনা। আমার মায়ের কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় কয়েক শ মানুষ হয়ে গেল। সবাই আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টি দিয়ে তাকাচ্ছে। দরজার সামনে যেতেই মা এসে আমার উপর ঝাপিয়ে পড়ল। বুকে জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি আল্লার কাছে আমানত দিয়েছি। তোমার কিছু হবেনা। কিন্তু মানুষ এসে এসব কি বলে। মানুষের মুখে ছাই পড়ুক।

শুনলাম আমাদের গ্রামের কুদ্দুস আমাকে দেখে এসেছে হসপিটালে নেয়ার সময়। সবাই বলেছে আমি বাঁচবনা। পিঠে শেল পড়েছে। আগরতলার হাসপাতালে বাচাঁনো যাবেনা। তাই কলকাতায় পাঠিয়ে দিচ্ছে। এ নিয়ে তর্ক হয়েছে। কুদ্দুস বলেছে, আমাদের ফজলুকে আমি চিনিনা! নিজে চোখে দেখে এসেছি!

আমি বললাম, কুদ্দুস ঠিকই দেখেছে। তার বাঁচার সাম্ভাবনা কম। তবে সে আমি নই। সে হল ক্যাপ্টেন ডালিম। সিলেটের করিমগঞ্জ সেক্টরে তার পিঠে শেল পড়েছে। তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। গতকাল আমি নিজেও গিয়েছিলাম তাকে দেখতে।

পরে শুনেছিলাম, কুদ্দুসেরও দোষ নেই। ডালিমের চেহারার সাথে আমার চেহারার নাকি অনেক মিল।

মায়ের বুক থেকে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি শ্যামলী দাড়িয়ে আছে একটু দূরে। তার চোখগুলো চিক চিক করছে। কোন কথা না বলে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল।

রানুর মধুর স্মৃতি - জ্বলজ্বলে স্মৃতির সামনে মনে হল একটা কুয়াশার প্রলেপ পড়ে গেছে। মনে মনে বলি, জীবনের শেষ মূহূর্তেও কৈশোরের স্মৃতি মুছে যায় না। রানুও মুছবেনা।

-একুশ-

জগন্নাথপুরের নুরু, রিফিউজি নুরু - স্কুলে যার কোন বন্ধু ছিলনা, তার সাথে দেখা হল জুন মাসে। দুনম্বর সেক্টরে নুরু মানে গোসাইকে চিনেনা বা নাম শুনেনি এমন লোক খুব কম ছিল। সে ছিল সত্যিই যোদ্ধা। আমরা ছিলাম তার কাছে নগন্য জীব। জীবন বাজি রেখে সে একটার পর একটা সফল অভিযান চালিয়ে গেছে। আখাউড়া থেকে শালদা নদী, ব্রাম্মনবাড়িয়া থেকে কোম্পানীগঞ্জ, গোসাই ছিল একটা বিভীষিকা। পঞ্চাশটারও বেশি ব্যাংক লুট করে টাকা জমা দিয়েছে জয়বাংলা অফিসে। তার কাছে অনেক পাক সেনা আত্নসমর্পন করেছে। সেপ্টেম্বরে দশ জনের যে দলটা আত্নসমর্পন করে তখন আমি ছিলাম খুব কাছেই। গিয়ে দেখি পাক বাহিনীর কমান্ডারের একটা হাত নেই। গ্রেনেডে উড়ে গেছে। তাকে যখন জিজ্ঞেস করলাম, এই খানের বাচ্চা, তোকে ছেড়ে দিলে এখন কি করবি? সে অকুতোভয়ে উত্তর দিল, লেড়েগা! আরও মজার ব্যাপার, তাকে যখন ট্রাকের পেছনে উঠতে বলা হল, সে কিছুতেই পেছনে

উঠকো। বলল, ম্যায় সিপাহি নেহি হো।

এই অর্ধবৃত্তের মাঝখান দিয়ে এপার ওপার যাবার পথ বন্ধ করতে পারেনি কেউ। মানুষ এপার থেকে ওপারে পাড়ি দিচ্ছে। বন্যার জলের মত। রাতের আঁধারে। প্রতি রাতে। হাজার হাজার। পাক বাহিনী শত চেষ্টা করেও আসা যাওয়া রোধ করতে পারেনি। ছতুরার ভিতর দিয়ে সি, এন্ড বি সড়ক পার হয়ে, বিনাউটি হয়ে, গোপিনাথপুর অথবা মনিঅন্দ পার হয়ে, বাড়াই গ্রামের ভেতর দিয়ে ওপারে যাবার পথ ছিল সহজ। বঙ্গবন্ধুর ছেলে শেখ কামালকে এ পথ দিয়েই নুরু পার করেছিল। সেই থেকে কামালের সাথে নুরুর একটা বিশেষ ভাব হয়ে যায়।

হঠাৎ শুনলাম সয়দাবাদের জহির রাজাকার হয়ে গেছে। যে ছিল মনে প্রানে বাঙালি। কলেজে ছাত্রলীগ করত। পাক বাহিনীর ঘোর বিরোধী ছিল। হঠাৎ করেই সে দখলদার বাহিনীর সাথে হাত মিলিয়ে ফেলল। তার পিতার খুনের বদলা নেবার জন্য। মুক্তিবাহিনী তার পিতাকে খুন করেছে। ব্যক্তিগত আক্রোশ মিটিয়েছে তাদের গ্রামের একজন। বহুদিনের শত্রুতা ছিল গ্রামের সালামদের সাথে। সালাম মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষন নিয়ে গ্রামে ফিরে এসে প্রথমেই তাদের বহু পুরাতন শত্রুকে খতম করেছে। তারই পাল্টা জহিরের এই সিদ্ধান্ত।

তখন জুলাই মাস। খালবিল জলে কানায় কানায় পূর্ণ। একদিন সকালে একটা নৌকা এসে থামল জহিরদের বাড়ীর ঘাটে। দুজন মুক্তিযোদ্ধা বাড়ীর ভেতর গিয়ে ঢুকল। জহিরের বাবা তখন ভাত খাচ্ছিলেন। একজন তাকে বাইরে আসতে বলল। তাদের হাতে অস্ত্র দেখেই জহিরের বাবা ভয় পেয়ে গেলেন। বাইরে আসতেই তার হাত পেছনে নিয়ে বেঁধে ফেলল। তারপর চোখ বেঁধে নৌকায় নিয়ে হাতপা বেধে বিলের মাঝখানে পানিতে ফেলে দিয়ে চলে গেল। গ্রামের মানুষ চেয়ে চেয়ে দেখল। লোকটা ডুবে গিয়ে হঠাৎ করেই মাথাটা পানির উপর ভেসে উঠে। ক্ষনেকের জন্য আকাশ ফাটা একটা চিৎকার বিলের জলে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে মিলিয়ে যায়। এক সময় জহিরের বাবাও মিলিয়ে গেল অথৈ জলের নীচে।

পরেরদিন ভেসে উঠা লাস দাফন করে জহির সোজা চলে গেল পাক বাহিনীর ক্যাম্পে।

জহির এখন রাজাকারের সর্দার। কিন্তু সবাইর জন্য সে রাজাকার নয়। শুধু ঐ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য। যারা তার বাবাকে খুন করেছে তাদের জন্য। সি এন্ড বি সড়কের উপর টি স্টলে বসে থাকে। পাক বাহিনী কখন আসবে, কখন কোথায় যাবে সব তার জানা। এই সি এন্ড বি সড়কটাই ছিল জল্লাদ বাহিনীর টহলের সীমা। একটার পর একটা ট্রাক টহল দিয়ে যায়। এই সড়কটা পার হতে গিয়েই অনেকে প্রাণ দিয়েছে পাক বাহিনীর হাতে। সড়ক পার হতে পারলেই আর ভয় নেই। তখন মানুষকে সাহায্য করত জহির। সড়ক পার করার জন্য সে নিজে পাহারা দিত। সময় বলে দিত কখন পার হবার উপযুক্ত সময়। সে ভাবেই মানুষ পার হত।

আগরতলা জয়বাংলা অফিসে গিয়ে দেখি জগন্নাথ কলেজের জিন্নাহ্ বসে আছে। তার একটা হাত ব্যান্ডেজ করে বুকের সাথে বাধা। জিজ্ঞেস করলাম, কিরে তোর এ অবস্থা কেন? হাত কোথায় কিভাবে ভাঙলি?

ভাঙ্গে নাই দোস্ত! কইওনা কারও কাছে। আসলে কিচ্ছু অয় নাইক্কা। মাইনসের কাছে তো কইছি পাকিস্তানি আর্মি ধইরা নিয়া ভাইঙ্গা ফালাইছে। না অইলে তো ট্রেনিংএ যাইতে অইব! তাই হালায় বাইন্দা রাখছি। তয় ঘুমাইবার সমে খুইল্লা ফালাই, আবার সকালে লাগাইয়া ফালাই। কি করমু কও, এই শইল লইয়া কি যুদ্ধ করন যায়? তাই এইডা করতে অইল।

থাকিস কোথায়?

ওইতো, গাজি ভাই যে হোটেলে আছিল, সেই হোটেলে। গাজি ভাইই কইয়া দিছে। কোন অসুবিধা নাইক্কা।

বললাম, যুদ্ধটা বোধহয় তোদের আরামের সুযোগটা বাড়িয়ে দিয়েছে। তোদেরকে দেখলে মনে হয়না, দেশ স্বাধীন করার কোন চিন্তা তোদের আছে। মরছে তো সাধারণ মানুষ, তোদের বা নেতাদের কিছু যায় আসেনা। মনে হয় তোরা আনন্দ ভ্রমণে এসেছিস। শুধু আরাম করার জন্য।

জিন্নাহ হাসল শুধু।

তোদের নাদুস নুদুস চেহারা আর আরাম দেখলে ঈর্ষা হয়না, ঘৃণা হয়, বলে আমার পথে চলে গেলাম।

- বাইশ -

১৬ই ডিসেম্বর নিয়াজির আত্মসমর্পনের খবর শোনার সাথে সাথেই নেতারা নিখোঁজ হয়ে গেলেন। কে কোথায় আছে কোন খবর পাওয়া গেলনা। যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে প্রশাসনের সাথে যারা যুক্ত ছিলেন, তারা হঠাৎ করেই আবিস্কার করলেন তারা নেতাহীন। খবর নিয়ে জানা গেল নেতাদের মাঝে প্রতিযোগিতা। কে কার আগে রাজধানীতে গিয়ে পৌঁছবে সেটাই নেতাদের নিখোঁজ হবার কারণ। তাদের অধীনে কয়েক হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে কোন নির্দেশ না দিয়েই রাজধানী অভিমুখে রওয়ানা দিলেন। সাথে তাদের আত্নীয়স্বজনও। তখন সোজা ঢাকা পৌঁছার কোন যানবাহনই ছিলনা। পথঘাট সব বিচ্ছিন্ন। কেউ হেলিকপ্টারে, কেউ নিজেদের ব্যক্তিগত গাড়ী বা অন্য যানবাহনে রাতারাতি এসে পৌঁছলেন রাজধানীতে। ক্ষমতার ভাগ বিলি হচ্ছে সেখানে। যারা পেছনে আসবে তারা সিংহভাগ থেকে বঞ্চিত হবে। তাই কাউকে কিছু বলে আসা বা নির্দেশ দেবার সময় নেই কারও। তেমনি একটা ছুটন্ত জীপে লাফ দিয়ে উঠে বসলাম। ১৯শে ডিসেম্বর এসে পৌঁছলাম ক্ষমতার কেন্দ্রস্থলে।

জয়ের উল্লাস। আনন্দের জোয়ার বইছে শহরের অলিতে গলিতে। দীর্ঘ নয়টি মাস পর মানুষের মুখে হাসি ফুটেছে। আপনজন হারানোর পরও সমস্ত নগরী আনন্দের জোয়ারে প্লাবিত। আমরা নতুন জাতি, নতুন জীবন পেয়ে নতুনভাবে শুরু করব এই আমাদের আনন্দ। পাওয়ার আশায় হারানোর বেদনা স্তিমিত হয়ে গেছে। প্রতিটি মানুষের মুখে আজ হাসি। আনন্দের হাসি, স্বাধীনতা পাওয়ার আনন্দ! কারও্র কোন দুঃখ থাকবেনা। নেতারা তাদের বক্তৃতায় তাই আশ্বাস দিয়েছিল। ওয়াদা করেছিল। সেসব ওয়াদা পূর্ণ হবে। শুধু একটু সময়ের প্রয়োজন। তাই জনগন আনন্দের জোয়ারে নিজেদেরকে ভাসিয়ে দিয়েছে।

ঠিক সেই সময় ক্ষমতার ভাগাভাগি হচ্ছে, লড়াই চলছে। ক্ষমতায় টিকে থাকতে হলে কি কি করনীয় তার ছক কাটা হচ্ছে। কোন্ কোন্ দিক থেকে ক্ষমতার উপর আঘাত আসতে পারে সেদিকগুলো আগে বন্ধ করতে হবে। না হয় দেশ চালানো যাবেনা।

এই আনন্দ স্রোত পেরিয়ে প্রথমেই গেলাম ব্যাংকে। আমার বিহারী মুসলিম ভাইদের খোঁজে। অফিসে একটা হৈচৈ পড়ে গেল। কাজকর্ম বাদ দিয়ে সকলে ছুটে এল। আমার প্রথম প্রশ্ন ছিল, কোথায় আমার মুসলিম বিহারি ভাইয়েরা?

যারা বলছিল মুসলিম ভাই ভাই?

একজনও নেই। ছাত্তার বর্তমানে সিনেমা করে, নিজের বাড়ী বিক্রী করে সেই বাড়ীতেই ভাড়া থাকে। বলল, এখন ওরা এপারেও নেই, ওপারেও নেই। এখন ওরা সেপারে। যেখানকার জিনিষ সেখানেই চলে গেছে। তবে তারা আগেই বুঝেছিল। তাই মিলিটারি দেখলেই কোলাকুলি করত। ফসিহ তো বাসায়ও দাওয়াত করছিল কয়েকজনকে। ওরাই পার করে নিয়ে গেছে। তবে তোরে পাইলে ওরা খুব খুশি হত। গভর্নরের পি,এ ইসহাকের ড্রয়ারে একটা লিস্ট পাওয়া গেছে। এক নম্বরে তোর নাম। লিস্টটা এখন বি,এ খান সাহেবের কাছে আছে।

তারপর বলল, পাকিস্তানি আর্মি গেছে, ইন্ডিয়ান আর্মি এসেছে। এখন সাহা বাবুকে একটা ধমক দিতে হবে তোর। সেও ইন্ডিয়ান আর্মিকে বাসায় দাওয়াত করে খাইয়েছে। দেখলেই খুশিতে নেচে উঠে। যেমন পাকিস্তানি আর্মি দেখলে বিহারিরা নেচে উঠত।

বন্ধুবান্ধবের খবর নিতে বেরিয়ে পড়লাম। যারা বেঁচে আছে তারা প্রায় সকলেই তবলিগে যোগ দিয়ে মসজিদে মসজিদে মুসুল্লিদের সাথে কাটিয়েছে এই নয়টি মাস। যারা নেই তাদের মাঝে আমার সবচেয়ে আঘাত লেগেছে জায়েদ আর আলাউদ্দিনের জন্য। বাসাবো রিফিউজি কলোনির রাজাকারেরা জায়েদের হোটেল লুট করে তার লাশটা চুলোর ভেতর রেখে দিয়েছিল। কবর দেয়া যায়নি। মালতি তার বাচ্চাদের নিয়ে সরে পড়েছিল বলে বেঁচে আছে।

অক্টোবর মাসে আলাউদ্দিনের সাথে দেখা হয়েছিল। আগরতলার কামান চৌমুহনিতে বাসে উঠতে যাচ্ছিল। দেখেই ডাক দিলাম। অনেকক্ষন কথা হল। তার মনে অনেক দুঃখ। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যে দুর্নীতি সে দেখেছে তাই নিয়ে অনেক দুঃখ প্রকাশ করল। বলল, আমি ফিরে যাব ঢাকায়। আমি তাকে বার বার নিষেধ করলাম। এখন ফিরে যাবার সময় নয়। তাছাড়া তুই ছিলি বাসাবো আওয়ামি লীগের সেক্রেটারি। তোকে তো কেউ ছেড়ে দেবেনা।

সত্যি সত্যি যে সে চলে আসবে ভাবতে পারিনি। ১৪ই ডিসেম্বর তাকে বাসাবো রিফিউজি কলোনির রাজাকারেরা ধরে নিয়ে যায়। তাকে সাথে সাথেই মারেনি। আগে তার চোখ দুটো তুলে নিয়ে হাত পা ভেঙ্গে মাদার টেকের রাস্তার পাশে ফেলে রাখে। তখন ওসব এলাকায় রাজাকার ছাড়া কোন মানুষজন নেই। ষোলই ডিসেম্বরে তার লাশটা আবিস্কার করে মাদারটেকের লোকেরা। তখনও তার শরীর তাজা ছিল। মনে হল কিছুক্ষন আগে মারা গেছে।

ঢাকা শহর মুক্তিযোদ্ধায় ছেয়ে আছে। চেহারা দেখে মনে হয় খুব আরামেই যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে। আরও ঘুরে বুঝতে পারলাম তারা ষোল ডিভিশন। কেউ রাজাকার ছিল, কেউ অস্ত্র কুড়িয়ে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হয়েছে। অস্ত্র জমা দিয়ে রাজাকারও মুক্তিযোদ্ধা হয়ে গেছে। রক্ষিবাহিনীর এত দুর্নাম হবার কারন মুক্তিযোদ্ধা নয়। অনেক রাজাকার অথবা পাক বাহিনীর সহযোগীরা বিনা পরীক্ষায় রক্ষিবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। তারা তাদের ঝাল মিটিয়েছে। অনেক সময় আওয়ামীলীগের কর্মীকেও নির্যাতন করেছে। উদাহরণ স্বরূপ বাংলাদেশ ব্যাংকের দারোয়ান ফরাসতের কথা বলা যায়। ফরাসত নয়টা মাস পাক বাহিনীর সহযোগিতা করেছে, ব্যাংকের গেইটে চেক করার নামে শত সহস্র লোকের পকেট সাফ করেছে। স্বাধীনতার পর কিছুদিন লুকিয়ে থেকে রক্ষিবাহিনীতে যোগ দেয়। তখন তার হাতে অনেক ক্ষমতা। তার অপরাধের প্রশ্ন তোলার সাহস কারও ছিলনা তখন।

অস্ত্র জমা হয়ে গেল। নেতারা আবার নেতা হয়ে গেলেন। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস নেতারা খুব একটা নেতৃত্ব দেখাননি। মুক্তিযোদ্ধাদেরকে অনেকটা সমীহ করে চলতেন। অস্ত্র জমার সাথে সাথেই তাদের সুর পাল্টে গেল। সেই পুরাতন

নেতার সুর। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে নেতা আর মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে একটা ভ্রাতৃত্বভাব ছিল। অস্ত্র জমার সাথে সাথেই সে ভ্রাতৃত্বভাব অদৃশ্য হয়ে গেল রাতারাতি। যে নেতারা মুক্তিযোদ্ধার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে অনেক চিন্তা করত, সে নেতা এখন আদেশ করে। মুক্তিযোদ্ধার ঐক্য নষ্ট করার যত ফন্দি ফিকির সবকিছুর আশ্রয় নিয়ে অল্পদিনের মাঝেই কৃতকার্য হল নেতারা। তাদের কাজকর্ম কথাবার্তায় এটাই মনে হয়েছে যে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে নেতাদের বোধ হয় এমন একটা অলিখিত চুক্তি ছিল যে, তোমরা- মুক্তিযোদ্ধারা দেশের জন্য যুদ্ধ করবে, রক্ত দেবে, মরবে। তারপর দেশ স্বাধীন করবে আমাদের জন্য। আমরা- নেতারা, তোমাদের লাশের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে ক্ষমতার সিংহাসনে আরোহণ করব। তারপর তোমাদের নাকের ডগা দিয়ে দেশটাকে নিয়ে পুতুল খেলা খেলব। আমাদের, আমাদের আত্মীয়স্বজন, তার আত্মীয়স্বজন, তস্য আত্মীয় তারও আত্মীয়ের স্বার্থে। এমনি করে আমরা দেশটাকে আমাদের কাজে, আমাদের স্বার্থে ব্যবহার করব।

ক্ষমতার ভাগ আমিও নেব। আমিওতো জীপে করে প্রথম সারিতে ক্ষমতার কেন্দ্রস্থলে এসেছিলাম। তাই ক্ষমতা দখল করব। এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট অফিসে একটা পদ খালি আছে। সহকারি পরিচালক। গিয়ে দেখি অমিয় বসে আছে। আরে তুই এখানে? কখন এলি? কার কাছে? কি কাজে?

এক সাথে এতগুলো প্রশ্ন করে নিজেই বোকা হয়ে গেলাম। সে শুধু বলল, একটা চাকরির জন্য এসেছি। পাকিস্তান আমলে তো আমাদের চাকরি ছিলই না। এখন তো চাকরী হবে।

আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কথা বলার ধরন, গাম্ভীর্য, গলার স্বর উঠানামা ইত্যাদিতে মনে হল অন্য কোন অমিয়। আমি যার সাথে ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছি এ অমিয় সে অমিয় নয়। তার কথা বলার মাঝে যে একটা কোমলতা ছিল তা যেন কমে গেছে।

হবে মানে? সব ব্যবস্থা করে ফেলেছিস?

এখন তো অনেক চাকুরি খালি।

হাঁ, মুক্তিযোদ্ধাদের দিতে হবে আগে। তুইতো মুক্তিযুদ্ধে যাসনি এত করে বলার পরও। তাহলে আজ একথা বলতে পারতি। একটা ভাল পজিশনে থাকতি।

এখনও থাকব।

থাকলে তো খুব ভাল। দেখ চেষ্টা করে।

তার কথা বলার ধরন দেখে আমার আর কথা বলতে ইচ্ছে হলনা।

ওখান থেকে বেরিয়ে রিক্সায় উঠতে যাব দেখি জিন্নাহ গাড়ীর দরজা খুলে ডাকছে। তাকিয়ে দেখি তার পরনে খাকি ড্রেস। খাস মিলিটারি। কিছু বুঝতে না পেরে তার দিকে তাকিয়ে আছি। আমার ভ্যাবাচেকা ভাব দেখে সে আবার ডাক দিল।

কি অইল? চিনবার পারতাছো না? আগে উঠ, পরে চিন।

যন্ত্রচালিতের মত গাড়ীতে উঠলাম। তখনও তার দিকে তাকিয়ে আছি। ভাবছি, সে কখন খাস মিলিটারি হল? জিন্নাহ নিজেই পরিস্কার করে দিল।

দোস্ত, এই কাপড়টা না অইলে কিচ্ছু করা যায় না। তাই বানাইয়া লইছি। এই গাড়িটাও লইছি। আর একটা ইন্ডাস্ট্রি। চল, দেখবা।

আমার ইচ্ছে হল তখনি নেমে যাই। বললাম, না দোস্ত, আমার অনেক কাজ আছে। এখন একটা মিটিং আছে। তুমি আমাকে ব্যাংকের সামনে নামিয়ে দাও। পরে একবার গিয়ে সব দেখে আসব। জিন্নার গাড়ী থেকে নেমে ব্যাংকের আমতলায় দাঁড়িয়ে ভাবলাম। যারা অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছে তারা অশিক্ষিত বা আধা শিক্ষিত দিনমজুর। তারা শহর চিনেনা। চিনলেও জানেনা কোথায় ক্ষমতার ভাগ পাওয়া যায়। কোথায় স্বাধীনতার স্বাদ লুকিয়ে আছে। জানেনা শহরে কি হচ্ছে। জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করে দেশ শত্রু মুক্ত করেছে। তারা এইটুকুই জানে বাংলাদেশ এখন স্বাধীন। তাদের পাওনা ঘরে পৌছবে। অধিনায়ক আশ্বাস দিয়েছে। যারা শহীদ হয়েছেন তাদের নিকটজন নেতাদের পথ চেয়ে বসে আছে। কিন্তু হায়, যুদ্ধে সন্তান হারিয়ে মুখের প্রবোধ বাক্যও শুনতে পায়নি কেউ। এখন দেশটা নেতাদের, তাদের সন্তানসন্ততি আর জিন্নাদের। আসল মুক্তিযোদ্ধাদের নাম হারিয়ে গেছে এই শহরে। যেখানে রচিত হবে বাংলাদেশের ইতিহাস। এখানে কেউ কারো কথা মনে রাখেনা। নিজেদের আখের নিয়েই সবাই ব্যস্ত।

স্বাধীন দেশে আমরা স্বাধীন নাগরিক। স্বাধীনতার স্বাদ ঘরে ঘরে না পৌঁছলেও অনেকের হাতে পৌঁছেছে। তা দেখে দেখে উদাস হয়ে যাই। মানুষের চালচলন বদলে গেছে, ব্যবহার বদলে গেছে, সুর বদলে গেছে। লোভ বেড়েছে, স্বার্থপরতা বেড়েছে। আপনজন হারিয়েছে, তার সাথে মানুষ বিবেক হারিয়েছে। অন্যায় কাজ করতে কারও বিবেকে বাধেনা। রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে দেখি, স্বাধীনতার আগে যে কলা বিক্রি করত সে আজ গাড়ীর পেছনে বসে আছে। দু ট্রাংক বোঝাই টাকা নিয়ে উড়োজাহাজে করে চট্টলায় যায় জুয়া খেলতে। হায় আমার স্বাধীনতা! যখন দেখি সেই ভিক্ষুক, স্বাধীনতার আগে যেখানে শূন্য থালা হাতে বসে থাকত আজও সেখানেই এমনি বসে আছে, তখন আমি আনমনা হয়ে যাই। যখন দেখি পীরজংগি মাজারের পাশে, রেলওয়ে কলোনির গেইটে পা ছড়িয়ে, ঘাড় কোনদিনই আর সোজা হবেনা যার, সেই ভিক্ষুকটি নীরবে হাত বাঁড়িয়ে বসে আছে তখন মনে প্রশ্ন আসে - কার জন্য এ স্বাধীনতা?

একদিন মান্নানের সাথে কথাটা বলেছিলাম। বলেছিলাম, অনেকে বদলে গেছে তা দেখে আনমনা হয়ে যাই। কিন্তু অমিয় তো আমাদেরই একজন। সে এমন বদলে গেল কি করে?

মান্নান বলল, ইন্ডিয়া সাহায্য না করলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতনা তা আমরা মানি। অমিয় মনে করে ইন্ডিয়া মানে ওরা। ইন্ডিয়ার আর্মি আমাদের সাহায্য করেছে, ও মনে করে ঐটাই তাদের মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা। তাই সবকিছুতে তাদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। অমিয় আর একটা কাজ করেছে। আমাদের এমপি সাহেব তো যুদ্ধের সময় অমিয়র পিসির বাড়ীতে থাকত। তার পিসির মাধ্যমেই এমপি সাহেব অমিয়র চাকরির ব্যবস্থা করছে। তাই তার মুখের এত জোর।

আমি বললাম, তাহলে বিদেশ থেকে সুপারিশ?

হ্যা, ফরেন রিকমেন্ডেশন আর কি !

আমাদের তো বিদেশি রিকমেন্ডেশান নেই, আমাদের কি হবে?

আমরা দেখব। ওরা বড় বড় চাকরি করবে, আমরা দেখে আশ মেটাব। দেখনা, দশ বছর আগে জমি বিক্রি করে গেছে। এখন এসে বলে বিক্রি করে নাই। এসব নিয়েও তো বেশ কয়েক জায়গায় ঝামেলা হয়েছে। ইন্ডিয়ান আর্মি ফেরত না গেলে যে কি হত তা অনুমান করা যায় না। বঙ্গবন্ধুকে আমি আমার অভিবাদন জানাই, জাতি শুধু তাঁর শত কাজের একটি কাজের জন্যই কৃতজ্ঞ থাকবে, থাকা উচিত - তিনি ইন্দিরাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আমি জানতে চাই ইন্ডিয়ান আর্মি কবে ফেরত আসছে?' সেই কাজটুকু তিনি ত্বরিৎ সমাধা করেছিলেন। আর বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে বা যুদ্ধ যদি আরও পঞ্চাশ বছরও চলত তাতে অমিয়দের বা আমাদের নেতাদের কোন অসুবিধা ছিল না। সে চিন্তা করেই রাখাল সেখেরকোটের বাজারে একটা মুদির দোকান দিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত চাকরিটা কারও হয়নি। সেই থেকে অমিয়র সাথে আর দেখা হয়নি। অমিয় চলে গেল চট্টগ্রামে। ব্যবসা করে এখন। সবিতার সাথে পরিণয়ে আবদ্ধ হয়েছে।

-তেইশ-

টিকাটুলির মোড়ে দেশবন্ধু মিষ্টান্ন ভান্ডারে বসে খাচ্ছি। দেখি রাস্তা দিয়ে শ্যামলীর মতো একজন হেটে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়ে ডাবল মার্চ করলাম। কাছে গিয়ে দেখি সত্যিই শ্যামলী।

আরে! তুমি এদিকে কোথায় যাচ্ছ? পেছন থেকে জিজ্ঞেস করলাম।

ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে দেখেই খুশীতে একবারে টগবগ করে উঠল। ঝর্নার জলের মত কলকল করে বলল, কলেজ থেকে ফিরছি। আমাদের বাসা তো গোপিবাগ আড়াই লেন। আপনি জানেন না?

না, আমি তো কিছুই জানিনা।

আপনি তাহলে অনেক কিছুই জানেন না। স্বাধীনতার পর কত কিছু হয়ে গেল। মুক্তিযোদ্ধা নামধারী রাজাকারের ভয়ে মাস খানেক হল আমরা বাড়ীঘর জমিজমা সব বিক্রি করে এখানে বাড়ী কিনেছি। কিনতে বাধ্য হয়েছি। না হয় আমাকে নিয়ে টানাটানি হত। রাজিব ভাই ওয়াপদায় চাকরী করেন। বাবা মা সবাই এখন এখানে। আপনি এখানে কোথায় এসেছেন?

আমার অফিস তো এই যে রেজিস্ট্রেশন ইউনিট। তিনতলায় বসি।

এত কাছে! আমাদের বাসা থেকে তো পাঁচ মিনিটের পথ। চলুন আমাদের বাসায়। বাবা দেখলে খুব খুশী হবেন।

আজ নয়, আর একদিন যাওয়া যাবে।

না, আপনাকে না নিয়ে আমি যাচ্ছিনা।

ঠিকানটা দিয়ে যাও। আমি সময় করে একদিন আসব। আজ নয়।

না, একদিন আপনার সময় হবেনা। এখনই যেতে হবে।

আমি তো হোটেলের বিলও দিয়ে আসিনি।

দিয়ে আসুন।

দুজনে ফিরে রওয়ানা দিলাম মিস্টান্ন ভান্ডারের দিকে। শ্যামলী আমার পাশে পাশে হাঁটছে। লক্ষ করলাম তার মাঝে একটুও জড়তা নেই। বুঝতে পারলাম গ্রামের মানুষ তার সম্বন্ধে কেন এতসব কুবাক্য ছড়াত। তার কোন পর্দা পুষিদা নেই, যার তার সাথে যখন তখন কথা বলে। স্কুলে কেউ তাকে একটা বললে তিনটা শুনিয়ে দেয়। সে যেই হোক। আমাদের তখন স্কুল শেষ। শুনলাম শ্যামলীকে কে প্রেম নিবেদন করেছিল। উত্তরে চপেটাঘাত। স্কুলের ইতিহাসে এই প্রথম এমন কান্ড। একটা রিফিউজির মেয়ের এত বড় স্পর্ধা কেউ মানতে পারেনি। কিন্তু হেড মাস্টারের জন্য কেউ কিছু করার সাহসও করেনি। সেই থেকে সকলের ধারনা হয়েছে কলকাতার মেয়েরা এমনই দজ্জাল হয়।

বিল দিতে গিয়ে বললাম, তুমি কি খাবে?

না না, আমি ঘরে গিয়ে খাব।

মিস্টির ভান্ডার থেকে খালি মুখে ফিরে যাওয়া কি ভাল দেখায়।

না, আমি কিছুই খাবনা।

তুমি কিছু না খেলে আমিও যাবনা।

তাহলে বেশী কিছু খাব না কিন্তু।

তুমি কম খেলেও আমি বলব খেয়েছ, আর বেশী খেলেও বলব খেয়েছ। এখন তুমি ঠিক কর কম খেলে লাভ হবে কি। দেখলাম খাওয়ার ব্যাপারেও সে স্মার্ট।

শ্যামলীর পাশাপাশি হেঁটে, কথা বলতে বলতে তাদের ঘরে গিয়ে পৌছলাম। ঘরদোর বেশ সাজিয়েছে। আমাকে বৈঠকখানায় বসতে বলে সে ভেতরে গেল। সাথে সাথেই তার বাবা এসে একবারে জড়িয়ে ধরলেন।

তোমার কথা আমরা প্রায়ই বলি। একদেশ ছেড়ে আর এক দেশে এলাম নিজের দেশ মনে করে। অথচ টিকতে পারলাম না। এতদিন গ্রামে থাকার পরও একটা লোকের সাথে আমাদের ভাব হয়নি। কারও সাথে কথা বলে আরাম

পাইনি। একমাত্র তুমি ছাড়া। তোমার মত আরও যদি দুচারজন পেতাম, তাহলে বোধ হয় গ্রামে থাকতে পারতাম।

আপনারা কি একবারেই গ্রাম ছেড়ে দিলেন?

কি করব বাবা! আমি কে, কলকাতায় কি করতাম তা কেউ জিজ্ঞাসাও করেনি কোনদিন। আমার সবকিছু থাকতেও আমাকে বলে রিফিউজি। চিন্তা কর ব্যাপারটা। আমি কি রিফিউজি? জনম জনম থাকলেও তোমরা আমাদের আপন করে নিবেনা তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। ইন্ডিয়াতে আমরা সংখ্যালঘু ছিলাম। এপারে এসে আর একবার সংখ্যালঘু হলাম। ।এখন হলাম মুসলমান রিফিউজি সংখ্যালঘু। এই শহরে আমাকে কেউ রিফিউজি বলবেনা। আমার বাড়ী আছে, আমার পরিবার শিক্ষিত। আমি এখানে সকলের সাথে তাল মিলিয়ে চলছি। আমার একটা পরিচয় আছে এখানে। রিফিউজি হবার জন্য তো আমি গ্রামে যেতে পারিনা। যেখানে যেতে পারবনা সেখানে সম্পত্তি রেখে কি লাভ! তাই সব বেঁচে দিয়েছি।

আকবর আলী একটার পর একটা এমন সব গল্প বলতে লাগলেন যে আমি উঠব এ কথাটা বলারই সুযোগ পেলাম না। মনে হয় বহুদিন পর একজন মনের মত শ্রোতা পেয়েছেন। মাঝখানে একবার তাল কেটে দিয়ে বলে ফেললাম, আমার বেশ কিছু কাজ আছে। আমি এবার উঠব।

তিনি একটা আদেশের সুরে বললেন, তুমি না খেয়ে তো কিছুতেই উঠতে পারবেনা।

চা তো কয়েকবারই খেলাম, আর একদিন এসে খাব। আজ নয়।

আর একদিনেরটা আর একদিন খাবে। আজকেরটা আজকে খেয়ে যাবে। বস।

তিনি আবার গল্প জুড়ে দিলেন। এবারে এপার ওপারের তুলনা। কি চাননি, কি পাননি, এখানে কি কি অসুবিধা, ওখানে কি কি অসুবিধা ছিল। সব শেষে তিনি বললেন, ওখানেই বোধ হয় ভাল ছিলাম। তবে এখানে খোলাখুলিভাবে কোরবানীর স্বাধীনতা আছে। যা ওপারে নেই বললেই চলে। মুসলমান হিসেবে কোরবানী দিতে না পারলে মনে হয় বেহেসতের পুলসেরাতই বুঝি পার হতে পারবনা।

সন্ধ্যা হয়ে গেল গল্প করতে করতে। তারপর খাওয়ার টেবিলে বসে দেখি বিরাট আয়োজন। একবারে শাহী খানা। যাবার পরই শ্যামলী তার বাবার হাতে আমাকে সোপর্দ করে সেই যে গেল আর দেখলাম খাবার টেবিলে। নিজ হাতে পরিবেশন করছে। বুঝলাম রান্নায় তার মাকে সাহায্য করেছে। খাবার টেবিলেই তার দু ভাইএর সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। ছোট ভাই এম এ পড়ছে, বড় ভাই চাকরী করে। দুজনেই মিষ্টালাপী। চেহারা দেখেই বোঝা যায় আমাকে দেখে তারা খুব খুশী হয়েছে। কারও মধ্যে কোন জড়তা নেই। সবাই খোলাখুলি কথা বলছে। পরিবেশটা আমার কাছে খুব ভাল লাগল।

ঘরে ফেরে শ্যামলীর খুশী খুশী চেহারাটা চোখে ভাসতে থাকে। রানুর চেহারাটাও পাশাপাশি এসে দাঁড়ায়। একবার শ্যামলী একবার রানু। মনে হল রানুর ছায়াটা আমার পাশে পাশে আছে আর শ্যামলী জীবিত। স্বশরীরি। রানুর স্থান অন্তরের গভীরে। শ্যামলী চোখের সামনে, ঝলমলে। শরীরের শিরা উপশিরায় নাড়া দিয়ে ঝংকার তোলে, মনকে উচাটন করে দেয়। রানু মনের মনিকোঠায়, মৃদু লয়ে বাঁশি বাজায়। এমনি অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে

পড়লাম।

ঘুম ভাঙ্গল দরজার আওয়াজে। ধড়ফড় করে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখি নুরু দাঁড়িয়ে।

আরে! এত রাতে তুই কোথা থেকে?

আগে দরজা বন্ধ কর, তারপর কথা! বলে সে নিজেই দরজা বন্ধ করে দিল।

দেখি তার পা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ে ঘর ভেসে যাচ্ছে। আরে, একি! রক্ত! কিভাবে হল?

চুপ, কোন কথা বলিসনা। আগে একটা কাপড় দে, বেঁধে নেই। তারপর বলছি।

তাড়াতাড়ি করে গামছাটা এগিয়ে দিলাম। আমি হঠাৎ বুদ্ধিহারা হয়ে গেলাম। এই মুহূর্তে কি করা যায়। এত রাতে ডাক্তার কোথায় পাব? জিজ্ঞেস করলাম, এটা হল কিভাবে?

ডাকাতি! বুঝেছিস, ডাকাতি করতে গেছিলাম! মতিঝিলে, ব্যাংক ডাকাতি!

তুই ডাকাতি করতে গেছিলি? কিন্তু কেন? তুই যদি ডাকাতি করিস তাহলে দেশটা চলবে কি করে? তোর মত দেশপ্রেমিকরা ডাকাতি করবে তা ভাবতেই তো পারিনা!

তুই তো ভাবতে পারবি না অনেককিছু। আমার সাথে আরও যারা ছিল তাদের নাম শুনলে তো আরও আশ্চর্য হবি। আর ডাকাতি করি কি সাধে? কই আমার হিসেবটা তো কেউ দিলনা। ব্যাঙ্ক লুট করে আমি কোটি টাকা জমা দিয়েছি আমাদের এম,পি-র হাতে। সে টাকাটা সে কোথায় জমা দিয়েছে সেটা আমি দেখতে চাই। এতদিন ঘোরার পরও আমাকে পাত্তা দেয়নি। মনে হয় আমি এখন কিছুই না। বঙ্গবন্ধুর কাছে বলেও কোন কাজ হয়নি। বঙ্গবন্ধুকে উল্টাপাল্টা একটা কিছু বুঝিয়ে দিয়েছে। একটা ভাল চাকরি চেয়েছিলাম, তাও মনের মত পেলাম না। আমি কি দেশের জন্য কিছু করি নাইরে? তুই তো সব জানিস। নেতারাও সব দেখেছে, সব জানে। এখন এমন একটা ভাব দেখায় যেন তারাই সব করেছে। আমরা কিছুই না। তাদের ছেলেরা তো কেউ যুদ্ধে যায়নি। অথচ দেখ ওরা কোন্ অবস্থায় আছে। প্রত্যেকেই বাড়ী গাড়ি কোটি টাকার মালিক। আমার হবেনা কেন? এদেশ স্বাধীন করেছি আমি। আজ আমিই অবহেলিত!

আমি বললাম, ডাকাতি করে কি তুই বড় লোক হতে চাস? তাহলে ষোল ডিভিশনের সাথে তোর পার্থক্যটা কোথায়? তোর কাছ থেকে তো মানুষ এরকম আশা করেনি! দাঁড়া, আগে তোর রক্ত বন্ধ করতে হবে। কিভাবে? হঠাৎ মাথায় এল কুতুবের ভাই ডাক্তার। যত রাতই হোক ডাকা যাবে। বেরিয়ে গেলাম।

অনেক ডাকাডাকিতে তিনি উঠলেন। বললাম, একটা বিশেষ রুগি আছে আমার ঘরে। আপনার যন্ত্রপাতির বাক্সটা নিয়ে নিন সাথে। তারপর ঘরে এসে বললাম, এই রুগির কথা কোনদিন কারও কাছে প্রকাশ করতে পারবেননা। এমন কি কুতুবের কাছেও না। কিভাবে কোথায় এ যখম হয়েছে তাও জিজ্ঞেস করবেন না। গুলি লেগেছিল। এখন চিকিৎসা আপনার। কোন হাসপাতালে যেতে পারবো। সম্ভব নয়। সারতে যে কয়দিন লাগে আপনি সব করবেন। এ

আমার অনুরোধ।

তিনি কি মনে করলেন তিনিই জানেন। পরে যখনই আমার সাথে দেখা হত তিনি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন। তখন আমার মনে হয় তিনি নিশ্চয়ই ভাবছেন, মানুষ মুখে বলে এক আর কাজে করে আর এক। আমার মত ভাল ছেলেও যে ডাকাতি করে সে তো তিনি নিজেই দেখলেন। বিশ্বাস কাউকে করা যায়না। আবার বিশ্বাস না থাকলে চলাও যায়না।

সাতদিন জোর করে রাখলাম নুরুকে। তার কাছ থেকে অনেক কাহিনী শুনলাম। সে একা নয়, এমন আরও কিছু লোক যাদের নাম প্রকাশ করলে জাতির কলঙ্ক। সাতদিন এক নাগাড়ে নুরুকে বুঝালাম। যাকে নিজের জীবন বাজি রেখে শত্রুমুক্ত করলি, তাকেই আজ তুই অত্যাচার আর লুন্ঠন করছিস। তাহলে কি প্রয়োজন ছিল মুক্ত করার? জনগণ কি এই আশা করেছিল? এই কি স্বাধীনতার স্বাদ? তুই দেশের জন্য যা করেছিস তা জাতির ইতিহাসে থাকবে। জাতি তোর কাছে ঋনী। কিন্তু এখন যা করছিস তা তোর সব ভাল কাজকে মুছে দিবে। সামান্য খারাপ কাজটাই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, ভাল দিকটা ঢেকে যায়। আমার সাথে প্রতিজ্ঞা কর, এসব আর করবিনা।

তাহলে আমি চলব কি করে। আমার সংসার চালাতে হবে তো?

ডাকাতি করে কেউ সংসার চালায়? তাহলে বিখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা আর ডাকাতের মাঝে তফাৎটা কি? যে কোন একটা কাজ কর, সংসার চলে যাবে। তারপর কিছু পথ দেখিয়ে দিলাম। নুরু প্রতিজ্ঞা করল সৎপথে রোজগারের পথ বের করবে।

-চব্বিশ-

এখন প্রতিদিন আমি দেশবন্ধুতে খেতে যাই, শ্যামলী কলেজ থেকে ফেরে। সময় জানি। আগে শ্যামলী উল্টোদিকের ফুটপাথ দিয়ে যেত, এখন দেশবন্ধুর সামনে দিয়ে। আমার চোখ এড়ায়না। ডাক দিই। শ্যামলী আসে, এক সাথে বসে খাই, গল্প করি। অনেক কথা। শেষ হয়না। তারপর এক সাথে হাটতে হাঁটতে তাদের বাসায় যাই। সবাই খুশী হয়। এ যেন একটা নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাড়াল।

একদিন শ্যামলীকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাকে নিয়ে স্কুলে যে ঝামেলাটা হয়েছিল তার আসল ব্যাপারটা কি ছিল?

ব্যাপার ছিল অনেক কিছু। প্রথমটা ছিল আমি নাকি রিফিউজির মেয়ে। আমি অনেক সস্তা। আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করলেও প্রতিবাদ করার ক্ষমতা আমার থাকার কথা নয়। কারন আমি আপনাদের স্থানীয় মানুষ নই। উড়ে এসে জুড়ে বসেছি। মনে হয় অন্যায়ভাবে ঢুকে পড়েছি। আপনাদের দয়ার উপর টিকে আছি।

প্রথম প্রথম আমি মাথা নীচু করে স্কুলে আসতাম যেতাম। ক্লাশে আর কোন মেয়ে নেই। সব ছেলেরা আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকত মনে হয় এখনি গিলে ফেলবে। যেন কয়েকদিনের উপবাসী ভিক্ষুক কোন দোকানে আয়না দিয়ে ঘেরা মিস্টির দিকে তাকিয়ে আছে। মনে মনে গিলছে। একবার সুযোগ পেলেই হল। সব সাবাড় করে ফেলবে মুহূর্তে। কই, ইন্ডিয়াতে তো ছেলেরা মেয়েদের দিকে এমনভাবে নির্লজ্জের মত তাকিয়ে থাকে না! ক্লাশে কি পড়াতো সেদিকে অনেকেরই খেয়াল নেই। খেয়াল শুধু আমার দিকে।

এটা মুসলমান প্রধান দেশ। পর্দার বাইরে যাই বলে এসব সহ্য করতে হবে ভেবে নিয়েছিলাম। কিন্তু যখন চিঠি আসতে শুরু করল তখন দেখলাম অনেকেই আমার সাথে প্রেম প্রেম খেলতে চায়। আমি যদি রিফিউজির মেয়ে হয়ে ঘৃণার বস্তু হয়ে থাকি তাহলে প্রেম করতে আস কোন্ লাজে? তারও জবাব দিইনি। একদিন ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে গেল। একটা চড় কষিয়ে দিলাম। সেই গুন্ডাটা - কি যেন নাম। হ্যাঁ, মনে পড়ছে, কাশেম। ওরা নাকি বাড়ী থেকে বেরিয়ে দেখে বিল কি বিলই তাদের। লেখাপড়ার দরকার নেই। টাকার অভাব নেই। তারা টাকা দিয়েই মানুষ বিচার করে। সবচেয়ে পেছনে বসত। লেখাপড়া কিছুই জানে না। ভুল বানানে ভর্তি সেই চিঠির উত্তর দেইনি বলে সে আমার সামনে এসে জিজ্ঞেস করেছিল উত্তর দেইনি কেন? তখন উত্তর দিয়ে দিলাম। সমস্ত ক্লাশ একবারে ঠান্ডা। তারপর থেকে কেউ আমার দিকে তাকালে আমি কটমট করে এমন ভাবে তাকাতাম, সাথে সাথে চোখ নামিয়ে নিত।

সেই থেকে তাকাতই না। তবে আমি খুব ভয়ে ভয়ে থাকতাম। পথেঘাটে যদি কিছু করে। তাই বাবা প্রতিদিন স্কুলে দিয়ে আসতেন আবার নিয়ে আসতেন। সেই কাশেম মুক্তিযোদ্ধা নাম নিয়ে ফিরেছে। এসেই বাবাকে বলে, 'শ্যামলীকে আমার সাথে বিয়ে না দিলে জোর করে উঠিয়ে নিব। এক মাসের সময় দিলাম।' আমাদের কাছে তখন তাকে মুক্তিযোদ্ধা নয়, রাজাকারের চেয়েও জঘন্য মনে হল। সেদিন শেষ রাতেই বাবা আমাকে নিয়ে এলেন ঢাকায়। তখন থেকেই বাবা চিন্তা করতে লাগলেন অন্য কোথায়ও চলে যাবার। অথচ এই স্কুলটা দেখেই বাবা খুব খুশী হয়েছিলেন। বাড়ীর কাছে হাই স্কুল এমন বাড়ী আর কোথায়ও পাননি বিনিময় করার। থাকতে তো পারলেন না। এত সুন্দর জায়গা! জায়গাটার কথা বাবা ভুলতে পারেন না।

আমি বললাম, এত অল্প সময়ে সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক হয়নি তোমাদের। এখন একবার খবর নিয়ে দেখ। যারা আমাদের এলাকায় ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল, তারা এখন একজনও বাইরে নেই। সবাই জেলে। ওরা চারজন ছিল। সঠিক খবর নিতেওতো মাসখানেক সময় লেগে যায়। এখন আর কোন ঝামেলা নেই।

শ্যামলী বলল, এখন ঝামেলা থাকলেই কি, আর না থাকলেই কি! আমরা তো আর নেই। কত ইচ্ছে ছিল আমাদের। সকলের সাথে মিলে মিশে থাকি। তা হতে দিল না মাত্র কয়েকজন গুন্ডা ছেলে।

আমাদের মাঝে একটা অলিখিত চুক্তি হয়ে গেছে। নিজেদের অজান্তে। প্রতিদিন শ্যামলী আসে, আমি তার সাথে যাই। তাদের ঘরে বসে গল্প করি। ইদানিং আকবর আলী আমার সাথে খুব বেশি সময় নষ্ট করেন না। তার জরুরী কাজের অজুহাতে অন্য ঘরে চলে যান। আমি আড্ডা দিয়ে রাতে খেয়ে ঘরে ফিরি।

একদিন রাত এগারটায় ঘরে ফিরে দেখি আমার বিছানা দরজার বাইরে। খাট উল্টানো। বালিশ খাটের নীচে। খাটের উপর একটা কাগজে লেখা - শালা, এতদিনেও তোমার ঝামেলা শেষ হলনা? কাল এসে যদি তোকে ঘরে না পাই তাহলে সব জিনিষ অকশানে বিক্রি করে দেব।

নিয়ম ছিল অফিস থেকে ফিরে খাওয়া দাওয়া করে তাস নিয়ে বসা। যারা রেগুলার আসে তারা হল মিন্টু, হাবিব, ইদ্রিস। আমার অভাবে তারা কয়দিন তিন হাতে চালিয়েছে।

আজহারকে ডাকলাম। কিরে তুই দেখলিনা এসব? ওরা বাইরে ফেলে গেছে, তুই তো ঘরে নিতে পারতি?

স্যার, আমি কি করব! আমি নিতে চাইছিলাম, ওনারা দেননাই। বলে কি - তুই যদি ঘরে নিস তাহলে আগুন দিয়ে পুড়ে ফেলব। যার বিছানা তারে নিতে দে। এইমাত্র গেল ওনারা। ঘরের সব চাউল বেইচ্চা দিছে। সিগারেট আছিলনা। আমারে বাকি আনতে কইছিল। আমি না করায় হাবিব স্যারে চাউলের বস্তা নিয়া বেইচ্চা সিগারেট কিনেছে।

তাদের ব্যাপারটা বুঝতে চেস্টা করলাম। আমি ওদেরকে বলেছিলাম অফিসের কাজে এমনভাবে আটকে গেছি কাজ সারতে অনেক রাত হয়ে যায়।

মিন্টু জিজ্ঞেস করেছিল, কত দিন লাগবে ঝামেলা সারতে?

আরও কিছুদিন লাগবে।

সেই কিছুদিনের জায়গায় চার মাস হয়ে গেল। আমার ঝামেলা কমছেনা। বরং বাড়ছে। আমি যেন চুম্বকের আকর্ষনে প্রতিদিন চলে যাই শ্যামলীর সাথে। বন্ধুদের কথা আমার মনেই থাকেনা। খাট বিছানা ওরা যেভাবে ওলটপালট করেছে তেমনি শ্যামলী আমাকে - আমার আমিকে ওলটপালট করে দিচ্ছে।

সেদিন মনে হল আমার হৃদয়ের গভীরে যে রানু বসে আছে তাকে শ্যামলী এসে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে। চোখের সামনে থেকে ধীরে ধীরে শ্যামলী হৃদয়ে প্রবেশ করছে। এক যুগ যে চোখের আড়ালে আছে তাকে হারিয়ে দেয়া সহজ। রানুর স্মৃতি রোমন্থন করে যে পুলক অনুভব করতাম তা যেন হারিয়ে যাচ্ছে। আরও যদি দেরী করি তাহলে রানু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। শ্যামলীকে না বলে হঠাৎ কলকাতা যাবার প্রস্তুতি নিলাম।

## -পঁচিশ-

কলকাতায় পৌঁছানের কাহিনী বলে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাব না। শেষ পর্যন্ত টানা রিক্সায় মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর গ্রামে যখন পৌঁছলাম তখন বেলা দুটো। মনে মনে ভাবছি যার জন্য যাচ্ছি সে আছে কি নেই কে জানে! যদি না থাকে সারদাবাবু তো থাকবেন, না হয় কাকিমা। কাকিমা তো সেই ঘটনা ভুলতে পারবেন না, কাজেই আমাকেও ভুলবেননা। রিক্সা থেকে নেমে একজনকে সারদাবাবুর বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করলাম। সে চিনেনা বলে জানাল। নাকি চিনেও না চিনার ভান করল বুঝতে পারিনি। তারপর একটা ছেলেকে জিজ্ঞেস করায় সে বলল, রানুদিদের বাড়ী? তারপর বাড়ী দেখিয়ে দিল।

যাবার আগে সাজগোজের কোন কার্পণ্য করিনি। আগাগোড়া পুরো সাহেবি পোষাক। কারণ এতদিন পর আমার শিক্ষকের (নাকি আর কারও) সাথে দেখা করতে যাব। পোষাকের বাহাদুরি যেন কোথায়ও খুঁত না থাকে। সারদাবাবুর ঘরের সামনে গিয়ে নিজকে যেন বেমানান মনে হল। মনে হল এ পোষাক পরে আসা ভুল হয়েছে। উপায় থাকলে তখনই বদলে ফেলতাম।

একটা দুচালা টিনের ঘর। তরজার বেড়া। সামনে একটু বারান্দা। রাস্তা থেকে ঘরে যাবার দু পাশে ময়লা কাদা ভর্তি। মাছি ভন ভন করছে। বাংলাদেশে সারদাবাবুর বাড়ীর কথা মনে হল। সে বাড়ীর কি শান সৌকত ছিল, এখনও আছে। কিন্তু মালিক বদল হয়েছে। আগেকার দিনের জমিদার বাড়ীর সাথে তুলনা করা চলে। আর এই এখানে এত ছোট

To be continued...